৪
বিভিন্ন ভাবধারার প্রভাব

এস. বসু মল্লিক

আজ থেকে মোটামুটি ৩৫০০ বছর আগে আর্যরা ভারত আক্রমণ করে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তারা বর্ণ (varna) প্রথা চালু করেছিল। varna শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'গাত্রবর্ণ। এ প্রথায় চারটি বর্ণের মধ্যে তিনটি বর্ণ পরিষ্কার গাত্রবর্ণের অধিকারী আর্যদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, আর শেষ বর্ণটি ছিল অনার্য কালো গাত্রবর্ণ শূদ্রদের জন্য, এদেরই উপর আর্যরা দমননীতি চালাত। এই প্রথা থেকেই জন্ম নেয় জাতি বা শ্রেণী সমাজ। আর অবশিষ্ট মানুষরা ছিল Jana, বিভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক (আগ্নেয়া) এবং মঙ্গোলয়েড (কিরাতা)। প্রাচীন ভারতে, এ সমাজগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন আশুরা, কিরাতা, দ্রাবিড়, আন্ধ্রা, কেরালাপুতরা, খেরাপদ, বনগা, মাগাদা, কোল ও ভিল (Asuras, Kiratas, Dravidas, Andhras, Keralaputras, Chetraspadas, Bongass, Magadas, Kollas, Villas)।

Jana-রা ছিল একটি সমতাবাদী সমাজ ব্যবস্থার এবং একটি কোন-রকম জীবননির্বাহমূলক অর্থনীতির অধিকারী। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল কৃষি এবং শিকারী, আবার অন্যেরা ছিল শুধুমাত্র শিকারী; এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন ছিল পশুপালক। তাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর বলতে কেউ ছিল না, কেননা একই ব্যক্তি যেমন ভূমি কর্ষণ করত, তেমনি কুমোর বা তাঁতের কাজও করত, আবার অনেক সময় শিকারে বেড়িয়ে পড়ত। ভূমিসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক ছিল সমাজ। ব্যক্তিমালিকানা এ সমাজে পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল।

ব্রাহ্মণরা নিজেদের জগত-পরিধির বিস্তার ঘটায় এবং Jana-দের শূদ্র বা পাংখামা (Shudras or Panchamas) এর যে-কোন একটি জাতি বা বর্ণ ব্যবস্থাভুক্ত হতে অনেক বেশী বাধ্য করে। Jana-দের মধ্যে যারা মূলত কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত তারা শূদ্র বর্ণভুক্ত হয়, আর যারা প্রধানত শিকার করে বেড়াত তাদের পাংখামা (পঞ্চম বর্ণ ব্যবস্থা) বর্ণভুক্ত করা হয়, অর্থাৎ জাতিচ্যুত। এই শেষোক্ত দলকে অস্পৃশ্য ভাবা হত, তাদের বাধ্য করা হত সব ধরনের মলিন কাজ করতে এবং গ্রামের বাইরে বসবাসে। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে আর্যরা নদী উপত্যকাগুলো দখল করে নিয়েছিল, কেননা এগুলো ছিল খুবই উর্বর। এইভাবে উত্থান ঘটে একটি শক্তিশালী কৃষি সমাজের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণীয় সামন্ততন্ত্রের। Jana সমাজগুলোর অধিকাংশের বসবাস ছিল পাহাড়ে, বনে এবং কম উর্বর অঞ্চলে। তাদের সম্প্রসারণে দ্বিতীয় ভাগে, আর্যরা এমনকি এ সকল অঞ্চলকে জাঙ্গল (Jungle) রাজ্যগুলোর ঢিলেঢালা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল। পরবর্তীতে, ইসলাম রাষ্ট্রগুলো এবং ব্রিটিশরাজ আর্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যে পর্যন্ত না Jana-রা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পুরোপুরি বশ্যতাস্বীকার করে। স্বাধীনতার পর, Jana অঞ্চলগুলো সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী বহিঃশক্তি উভয়ের আগ্রাসনের মুখে পতিত হয়ে আরও অসহায় হয়ে পড়ে। বিট্রিশ সরকার Jana-দের উপজাতি (tribal) বলে অভিহিত করত আর তাদের নিজস্ব লোকেরা তাদের আদিবাসী বা আদিম (Adivasi or indigenous) বলে ডাকত ।

ভারতীয় সংবিধান কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায়কে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছে তফসিলি উপজাতি (STs) অথবা আনুশুচিৎ জনজাতি (Anusuchit Janajati) হিসেবে। পাংখামা বা অস্পৃশ্যদের শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে তফসিলি জাতি (SCs) অথবা আনুশুচিৎ জাতি হিসেবে। তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে সঠিক যে শব্দটির ব্যবহার হওয়া উচিৎ হল অনুশুচিৎ Jana, কারণ জনজাতি একটি

বিভ্রান্তিকর শব্দ যা স্পষ্টত এটাই নির্দেশ করে যে, Jana-রা আরও হচ্ছে জাতি (jatis)। এটা জাতি/বর্ণ বা আদিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট করে তোলে। অধিকন্তু, আদিবাসী সমাজের মাত্র একটি অংশকে তফসিলিভুক্ত করার কারণে, সংবিধান আসলে অ-তফসিলি আদিবাসীদের জাতি (jati) সমাজের সঙ্গে একীভূত করে ফেলেছে।

বিদেশী শক্তি ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের দীর্ঘ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কালে, আদিবাসীরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে। বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন এবং রাজনৈতিক ভাবধারা তাদের সংস্কৃতিতে বলিষ্ঠ প্রভাব ফেলেছে। যখন কিছু সমাজ বিজ্ঞানী এমন মত পোষণ করেন যে, পরিবর্তনগুলো ছিল অ-হিংস ও স্বাভাবিক এবং সাংস্কৃতিক, ভাবধারাগত ও সামরিক আগ্রাসনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই; তখন অন্যেরা এমন বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তাদেরকে মূলত আগ্রহশূন্য বহিঃশক্তিই উৎসাহ যুগিয়েছিল। অপরদিকে, শোষণমূলক সামন্তপ্রথা ও পুঁজিবাদের ব্যবস্থার মুখে আদিবাসীদের জোরপূর্বক ঠেলে দেওয়া হলে এটা তাদের জীবনধারায় একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে; তাদের তরফ থেকে এ ধরনের শক্তি অর্থাৎ সামন্তপ্রথা ও পুঁজিবাদের প্রতিরোধ তাদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিতকারী কিছু মৌলিক ভাবধারার অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

সংস্কৃত্যায়ন

বর্ণ (Jati) এবং আদিবাসী (Jana) সমাজগুলো অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার অধিকারী। মৌলিক পার্থক্যটি হল, ব্রাহ্মণীয় ব্যবস্থা হচ্ছে, শ্রেণীবিন্যাসমূলক আর বহু বর্ণে স্তরীভূত। অপরদিকে আদিবাসী ব্যবস্থা হচ্ছে, সমজাতীয় ও সমতাবাদী। যখন পূর্বেরটি পবিত্রতা ও দূষণের উপর ভিত্তি ক'রে, তখন পরেরটি সমতা ও ন্যায্যতার প্রস্তরযুগীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি ক'রে। সুদীর্ঘকাল ধরে এই দুটি ব্যবস্থা পাশাপাশি অবস্থান করে এসেছে আর একে-অপরের অনেক কিছুই আপন করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণীয় সভ্যতার উন্নত প্রাযুক্তিক দক্ষতা আদিবাসীদের আকৃষ্ট করলেও, বর্ণভিত্তিক সমাজ প্রধানত আদিবাসী এলাকাগুলো থেকে কাঁচা মাল অথবা এমনকি ঔষধি উদ্ভিদের সন্ধান করত।

দুই সমাজের মধ্যে সহাবস্থান ও সম্পর্ক আদিবাসী সমাজগুলোকে বর্ণ প্রথার একেবারে শেষ ধাপভুক্ত করার অবিরাম প্রয়াস দ্বারা চিহ্নিত। ব্রাহ্মণীয় সমাজের বিস্তৃতি উপরস্থ বর্ণগুলোর কল্যাণে অধিকতর কৃষি উদ্বৃত্ত দাবি করে। আর এই দাবি অনেক বেশী জমি চাষাবাদের যোগ্য করে তোলার দিকে এবং কৃষি তথা সংশ্লিষ্ট পেশায় লোকদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার দিকে চালিত হয়। ব্রাহ্মণীয় সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল চাষী, মিস্ত্রি এবং অন্যান্য সেবাধর্মী শ্রমিক হিসেবে আদিবাসীদের বেশী করে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। এই ব্যবস্থা নিজেদের স্বতন্ত্র প্রথা পালনের অধিকার তাদের দিয়েছিল, যদিও তাদের ছিল একটি তুলনামূলক দৃঢ় শাসনতন্ত্র। এমনকি তাদের দেব-দেবীকে ধীরে ধীরে হিন্দু সর্বেশ্বরবাদে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

তবে এমনটি মনে করা ভুল হবে যে, এই অন্তর্ভুক্তিকরণের ঘটনা ব্রাহ্মণীয় রাজ্য শক্তিগুলোর কোন রকম রাজনৈতিক চাপ ও সামরিক শাসন ছাড়াই ঘটেছিল। বাস্তবিকপক্ষে, ব্যবস্থাটি ছিল অনেক অত্যাচারী আর এর শাসনতন্ত্র ছিল শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ধারণার উপর ভিত্তি করে। সিঁড়ির একেবারে প্রথম ধাপের ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ শ্রেণীর আর সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপের শূদ্ররা ছিল সর্বাপেক্ষা অশুদ্ধ শ্রেণীর। পাংখারা যেহেতু শ্রেণী ব্যবস্থার বাইরে ছিল আর দাসের কাজ করত, তাই তাদের কোন পদমর্যাদা ছিল না, এ কারণে তাদেরকে এতই অশুদ্ধ ভাবা হত যে, এমনকি তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ানো হত না।

এই অনন্য শাসন ব্যবস্থা শূদ্রদের, এমনকি সমাজচ্যুতদের মধ্যে একটি বিশেষ ধারার জন্ম দিয়েছিল আর তা হল ব্রাহ্মণদের রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, জীবনধারা ও মতাদর্শ আপন ক'রে নেওয়ার মাধ্যমে উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করা। এই ধারাকে এম.এন শ্রীনিবাস সংস্কৃত্যায়ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। দাবি করা হয় যে, এমনকি স্বাধীন আদিবাসী সমাজগুলোও এই ধারায় প্রভাবিত হয়েছিল, কেননা তারা কিছু ব্রাহ্মণীয় ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিল। (এ ঘটনাকে আরও দেখা হয় আদিবাসীদের হিন্দুকরণ হিসেবে)। সাম্প্রতিক

গবেষণাগুলোয় আলোকপাত করা হয়েছে যে, সংস্কৃত্যায়ন শুধুমাত্র উপরে উঠার একটি পদ্ধতিই নয়, এটা আরও হল এমন একটি উপায়স্বরূপ, যার সাহায্যে আদিবাসীরা চাষী ও অন্যান্য বর্ণভিত্তিক শ্রেণীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের অংশ নিশ্চিতকরণের চেষ্টা চালাত। এসবের কিছু লক্ষণ হল, তাদের পক্ষে ক্ষত্রিয় পদমর্যাদা দাবি এবং পৈতে পরিধান।

হিন্দুধর্মের প্রভাব

খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মের মত হিন্দুধর্ম একই নয়। হিন্দুধর্মের একটি ব্রাহ্মণীয় গুড়ি বা কাণ্ড থাকলেও, এর রয়েছে অনেক অ-ব্রাহ্মণীয় শাখা-প্রশাখা। আদিবাসীরা, যাদেরকে বর্ণ ব্যবস্থায় প্রবেশে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের বিভিন্ন ধারণা ও ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার দরুণ বিকশিত হয়ে, হিন্দুধর্মের কিছু লৌকিক রীতি-নীতি অনেক মানবীয় গুণাবলী সযত্নে আঁকড়ে ছিল। আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে, মানু (মানু সংহিতা) আদেশ-নির্দেশের উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মণীয় হিন্দুধর্ম নিজেকে কখনোই প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। তাই, হিন্দু মিশনারীগণ সাধারণত আদিবাসী জনপদগুলোতে হিন্দুধর্মের জনপ্রিয় রীতি-নীতির বিস্তারে সচেষ্ট থাকতেন।

হিন্দু ধর্ম ও রাজনৈতিক দর্শন আদিবাসীদের বিভিন্ন সমাজকে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল। রাজস্থানের মিনারা (Meenas) যদি পরিধির এক প্রান্তে থাকে, তাহলে পরিধির অপর প্রান্তে হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগারা (Nagas)। বড় বড় আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে, মধ্যপ্রদেশের গন্দ (Gonds), ঝাড়খণ্ডের খেরো (Cheros) এবং বাংলার ভূমিজদের (Bhumijs) একটি অংশ হিন্দু প্রভাবাধীনে রাজ্য গঠন প্রক্রিয়ায় যোগদান করে, তবে এই প্রক্রিয়া উড়িষ্যার জুয়াং (Juangs), ঝাড়খণ্ডের বিরহোড় ও পাহাড়িয়ারা (Birhors ও Paharias), ছত্রিশগড়ের মারীয়া ও বিসন হেড গন্দরা (Maria S Bison Head Gonds) এবং উত্তর বাংলার রাভাদের (Rabhas) কমই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। এমনটি লক্ষ্য করা গেছে যে, উন্নত কৃষি চর্চা অনেক ব্যাপকবিস্তৃত ছিল, আর অনেক গভীর ছিল হিন্দুধর্মের প্রভাব। এ কারণে, জুয়াং, মারীয়া গন্দ ও বিরহোড়দের মত লুটেরা শ্রেণী হিন্দুধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে অনেক দূরে ছিল। কৃষি ও লুট উভয়ের উপর নির্ভরশীল মাতৃশাসিত খাসি ও গারো এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক ছোট ছোট আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু বিশ্বাস খুব কমই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। তবে, যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায় কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল, যেমন মুণ্ডা, সাঁওতাল, হোস, উঁরাও এবং ভিল (Mundas, Santals, Hos, Uraons, Bhils), তাদেরকে লৌকিক হিন্দুধর্ম গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ভক্তি আন্দোলনের সূর্য-পূজা, শৈববাদ ও বৈষ্ণববাদ আদিবাসীদের জীবনে বলিষ্ঠ প্রভাব ফেলেছিল। এগুলোর বিরুদ্ধ প্রভাবের কথাও অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করার মত :

(১) হিন্দু দেব-দেবীদের সঙ্গে আদিবাসী পরম সত্তাসমূহের সাদৃশ্যকরণ : মুণ্ডা ও সাঁওতালদের একটি অংশের মধ্যে হিন্দুধর্মের সূর্য দেবতাকে তাদের সিঙ্গবঙ্গার (Singbonga) সঙ্গে সমান বিবেচনা করার প্রবণতা কাজ করত। উঁরাওরা তাদের প্রার্থনা ও ধর্মানুষ্ঠানে মহাদেব ও পার্বতীকে স্থান দিয়েছে।

(২) অর্থবিত্তের দিক দিয়ে প্রভাবশালী আদিবাসীদের একটি অংশ হিন্দু ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে একইরূপ ধর্মানুষ্ঠান ও ঐতিহ্য গড়ে তোলে, যেগুলো ঐতিহ্যবাহী ধর্মানুষ্ঠান ও রীতিনীতির স্থান দখলের চেষ্টা করে।

(৩) আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু পুরাণ ও পালা-পার্বণের অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(৪) ঐতিহ্যবাহী নামগুলোর পরিবর্তে অবতারগণের হিন্দু নাম এবং পৌরাণিক ব্যক্তিদের নাম ধারণ।

(৫) বিভিন্ন সংস্কারবাদী ও পুনঃজাগরণ আন্দোলনের উত্থান যেগুলো হিন্দু পূজার্চনা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল, এ সকল আন্দোলন আদিবাসী ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, যেমন উঁরাওদের মধ্যে ভাগৎ (Bhagat) আন্দোলন, হোসদের (Hos) মধ্যে হরিবাবা (Haribaba) আন্দোলন, মুণ্ডাদের মধ্যে কৃষ্ণ (Krishna) ভক্তি, সাঁওতালদের মধ্যে সাফা হোড় (Sapha Hor) আন্দোলন এবং গন্ধ ও ভিলদের (Gonds and Bhils) মধ্যে অনুরূপ নানা

আন্দোলন।

একজন পাঠক মনে মনে আদিবাসী সমাজগুলো কেন আর কোন্ পরিস্থিতিতে কতিপয় হিন্দু রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল তা ভাবতে পারেন। এটা কি এ কারণে যে, তারা তাদের ইতিহাসের কোন এক সময়ে বুঝতে পেরেছিল যে, হিন্দুধর্মে অধিকতর ভাল বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান আছে ? না ! আদিবাসী সমাজগুলো কিছু হিন্দু রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল প্রধানত জবরদস্তিমূলক দমনীতির কারণে যার নেপথ্যে ছিল ব্রিটিশদের সাহায্যপুষ্ট হিন্দু রাজ্যগুলোর এবং পরবর্তীতে, উচ্চ বর্ণের শ্রেণীগুলোর আগ্রাসন নীতি। প্রথমদিকে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে এ আগ্রাসন প্রতিহত করার চেষ্টা করত। কিন্তু নিপীড়ন-শক্তিগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন সহজ-সরল আদিবাসীদের মনে এই বিশ্বাস কাজ করে যে, তাদের ঐতিহ্যবাহী দেবদেবী তাদের শত্রুদের পরাজয়ে এগিয়ে আসবে, যখন আসলে তেমনটি আদৌ ঘটেনি। এ ঘটনা সহস্রাব্দ ব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। তবে, জমিদারদের বুলেট কখনো 'জলে' পরিণত হয়নি, যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সাঁওতাল হুলের (Santal Hul) সিধু ও কানু অথবা মুণ্ডা উলগুলানের (Munda Ulgulan) বিরসা মুণ্ডা। তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিজয়ীদের ধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। মধ্যযুগীয় রাজ্যগুলো হিন্দুধর্মের মুখ্যচরিত্র বা অগ্রনায়ক হয়ে ওঠে। প্রসারণের প্রথম পর্যায়ে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজ্যও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উপর বিধিনিষেধ জারি ক'রে পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মকে সহায়তা যুগিয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

আদিবাসীদের মাঝে ব্রাহ্মণীয় হিন্দুধর্মকে সর্বোপরি এগিয়ে নিয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো। আদিবাসী সমাজগুলোর একটি অংশ এ বিশ্বাস নিয়ে হিন্দুধর্মের কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল যে, কংগ্রেস তাদের স্বাধীনতা দেবে। তবে এখানে স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র যে দিকগুলো তাদের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলোই তারা আত্মস্থ করে নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু দল নিরামিষভোজন নীতি বেছে নিয়েছিল, যেমন মুণ্ডাদের মধ্যে Birssaites, উঁরাওদের মধ্যে Tana Bhagats এবং সাঁওতালদের মধ্যে Sapha Hors। তবে তারা যেমন প্রধান ধারা হিন্দু সমাজে যোগদানে বর্ণ প্রথাকে বরণ করে নেওয়ার ফাঁদে পা দেয়নি, তেমনি তারা তাদের আদিবাসী পরিচয়ও বিসর্জন দেয়নি, ঠিক যেমনটি জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো চেয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর, জাতীয়তাবাদী শক্তি বা দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে ভারত চলে আসে। এ সকল দল তথা-কথিত মূলত হিন্দু শাসিত জাতীয় প্রধান স্রোতধারায় আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তকরণের নীতি অবলম্বন করে। প্রথম দিকে, ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশীদারিত্ব লাভের আশায় বেশ কিছু আদিবাসী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তোড়ে প্রভাবিত হয়ে হিন্দু জীবন পদ্ধতি বরণ করে নেয়। কিন্তু তারা অচিরেই এ ধরনের পদক্ষেপের নিষ্ফলতা বুঝতে পেরে ফিরে আসার চেষ্টা করে। ততক্ষণে, তাদের আদিবাসী সমাজকে ভূমি, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়ে ফেলার দরুণ অনেক দুভোর্গের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

পাশ্চাত্যকরণ

ব্রিটিশ শাসন ভারতে পাশ্চাত্য দর্শন, ধারণা ও ঐতিহ্য, ভাবনা ও আন্দোলন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প প্রভৃতির দুয়ার খুলে দিয়েছিল। এক শ্রেণীর মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের গতিশীল সামাজিক দিকসমূহে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল। উদার চিন্তাধারার পাশাপাশি, খ্রীষ্টধর্ম, সমাজবাদ ও মার্ক্সবাদ ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে নিপীড়িত শ্রেণীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আদিবাসী সমাজও এর বাইরে ছিল না।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর বিট্রিশ শাসনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে, খ্রীষ্টান মিশনারীগণ আদিবাসী এলাকাগুলোতে যাওয়া-আসা শুরু করেন। ব্রাহ্মণীয় হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র টান এবং রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্ণ ব্যবস্থার আরোপ, আর সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের

জমিদার, সুদের কারবারী ও পুলিশের নির্বিচার হামলা-আক্রমণ প্রতিহতকরণে লোকদের অক্ষমতা –এ বিষয়গুলো আদিবাসীদের একটি অংশকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ প্রক্রিয়া শত্রু শিবিরের মধ্যে মিত্রপক্ষ খুঁজে বের করার জাগতিক অন্বেষণ দিয়ে শুরু হয়। পরে, প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো নিষ্ঠুরভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হলে, এবং একটি গভীর সামাজিক হতাশাবোধ লোকদের আচ্ছন্ন করলে, খ্রীষ্টান মিশনারীগণের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান ও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ভূমি ও বন পুনরুদ্ধারে মিশনারীগণের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদিবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়।

আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ এবং খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের মধ্যে একটি লক্ষণীয় সাদৃশ্য খুঁজে পায়, আরও খুঁজে পায় তাদের অতীতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতা এবং তাদের বর্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা। খ্রীষ্টধর্ম সর্বোপরি তাদের সাহায্য করে নিজেদের ক্ষুণ্ন ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এবং তাদের আদিবাসী পরিচয় ঘোষণায় নৈতিক শক্তি অর্জনে। মিশনারীগণের পক্ষ থেকে আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা, আদিবাসীদের ইতিহাস রচনা, সামাজিক রীতিনীতির সমর্থন, ইত্যাদি এগুলো সমাজে একটি পুনঃজাগরণ আন্দোলনকে সূচিত করে। খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, স্বাস্থ্যসেবা এবং সুশৃঙ্খল জীবনধারা খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের জীবন-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে, আদিবাসীদের তাদের অতীত পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য খ্রীষ্টধর্ম দায়ী। সংস্কৃত্যায়নের নীতি অবলম্বন করার আগে, মণ্ডলীগুলো, বিশেষ করে রোমান কাথলিক মণ্ডলী, আদিবাসী জনপদগুলোতে আদিবাসী ঐতিহ্যকে দুর্বল করে দেওয়ার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা চালায়। ফলশ্রুতিতে, আদিবাসী ও খ্রীষ্টীয় পরিচয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে, এ বিষয়টি খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের গভীর বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দেয়। পরিচয় ও স্বাধীনতার জন্য আদিবাসীদের সংগ্রামের ইস্যুকে ঘিরে মণ্ডলীর মধ্যে ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্বও আদিবাসী আন্দোলনগুলির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। যখন একদিকে মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ববিদগণ সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পক্ষে, তখন অপর দিকে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী মাণ্ডলিক পরিচালকগণ বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার নীতি অনুসরণ করে। অধিকন্তু, প্রধান ধারার মণ্ডলীগুলো আদিবাসীদের একটি অংশের মধ্যে অভিজাততন্ত্রের উত্থানে অবদান রাখলে, এই ব্যবস্থা খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত সমাজ এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যে একটি ফাটল ধরায়। কোন কোন পর্যবেক্ষকের এমনকি বিশ্বাস, খ্রীষ্টীয়করণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে, ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী সমাজে হিন্দুধর্মের দিকে ঝোঁকার মত ঘটনা ঘটেছিল। জাতি-গঠনের স্বাধীনতা-পরবর্তী ভাবধারা, যা অধিকাংশ মণ্ডলী অনুসরণ করে, ভারতীয় বাস্তবতার বহুমুখিতাকে দুর্বল করে দেয় আর এইভাবে আদিবাসী পরিচয়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

বাম ভাবধারা

বিট্রিশ ঔপনিবেশবাদ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশবাদ আদিবাসীদের সারা ভারত জুড়ে পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের মুখে ফেলে দেয়। প্রারম্ভিক সফলতা সত্ত্বেও সহস্রাব্দব্যাপী নানা আন্দোলন ও খ্রীষ্টীয়করণ এ শক্তিগুলোর অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মোকাবিলায় অকার্যকর প্রমাণিত হয়। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইউরোপে গড়ে ওঠা বাম ভাবধারা আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে বিস্তারলাভ করতে শুরু করে আর ১৯২০ এর দশকে ভারতীয় কম্যুনিস্ট (সাম্যবাদী) পার্টি গঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ও ভূমি আন্দোলনগুলো আদিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সফলকাম হয়। সাম্যবাদী দর্শন আদিবাসীদের সমতাবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বেশ খাপ খায় বলে মনে হয়। উৎপাদন মাধ্যমসমূহের যৌথ মালিকানার সমাজবাদী চিন্তাধারা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা এবং সমাজ কর্তৃক পণ্যের সহভাগিতা এ বিষয়গুলো আদিবাসীদের ভীষণ নাড়া দেয়, কেননা এটাই ছিল তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা, যা বিট্রিশ শাসন ধ্বংসের পায়তারা করেছিল।

কাজেই, জনগণের ভূমি ও বন অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাম দলগুলোর শুরু করা সংগ্রামে বহু আদিবাসী যোগ দেয়। আর এইভাবে সারা দেশে একটি বাম

আদিবাসী নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটে, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলানগানা, ওরানগাল ও শ্রীকাকুলাম (Telangana, Warangal and Shrikakulam) জেলাগুলোতে, এবং মহারাষ্ট্রে, পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায় ও মধ্যপ্রদেশে। তেভাগা আন্দোলনের সময়, অবিভক্ত বাংলার আদিবাসী জনগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আজকে, একই আদিবাসী অঞ্চলগুলোর বড় একটি অংশ, যেগুলো আজকে ঝাড়খণ্ড ও ছত্রিশগড়ে অবস্থিত, নকশালবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। বাম ভাবধারা অনেক আদিবাসী অংশগ্রহণকারী ও নেতৃবৃন্দকে বর্তমান জগত ব্যবস্থার বিশাল পালে তাদের অবস্থা বুঝতে সাহায্য করেছে, তাদের আরও সাহায্য করেছে এর ঔপনিবেশিক, পুঁজিবাদী এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্য ও শোষণমূলক ব্যবস্থা বুঝতে। বাম আন্দোলন দলগুলো আদিবাসী আন্দোলন দলগুলোকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ক্ষুদ্র যত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলন দলগুলোর সঙ্গে মিশে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

তবে আদিবাসী সংস্কৃতি, পরিচয় ও স্বাধীনতার দাবির প্রতি বাম দলগুলোর অনীহা আদিবাসীদের উপর একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ কারণে, বাম-পরিচালিত আন্দোলনগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ ছিল নিরুৎসাহমূলক। তারা তাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা বাম ভাবধারার বিন্যাস বা পরিকল্পনায় খুঁজে পায়নি। (কিন্তু এরাই বাম আন্দোলনগুলোতে সবচেয়ে বেশী ত্যাগস্বীকার ও কষ্টভোগ করেছে)। এমনকি কিছু বাম দলের বিশ্বাস, আদিবাসী সমাজ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক। এ জাতির কোন ভবিষ্যৎ নেই, কারণ এ জাতি আদিম। তাদের চোখে আদিবাসীরা হচ্ছে, চাষী অথবা সামান্য দিনমজুর। এ ধরনের ধারণার বিস্তার কিছু আদিবাসী অনুসারীদের নিজেদের আত্মসম্মান ও জাতীয় গর্ব খোয়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আধুনিকায়ন

আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ভারতীয় আদিবাসী সমাজে গভীর ছাপ ফেলেছে। রাজনীতিতে সংসদীয় গণতন্ত্র, বয়স্কদের ভোটাধিকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ন্যায় নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে। এমনকি গ্রাম পর্যায়ে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণধর্মী গণতন্ত্রের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে। দলীয় রাজনীতি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া আদিবাসী সমাজের মধ্যে বিভক্তি ও বিদ্বেষ বয়ে আনে। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণা জনগণের জন্য একটি ধ্বংসের নীতি হওয়ার দিকে মোড় নেয়। আর জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ প্রেম আদিবাসীদের একটি অংশকে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, প্রশাসক, রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিনিধি – তাদেরকে, মাথাভারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে।

বিশেষ করে, তরুণদের মধ্যে নগর জীবনধারার প্রতি হাতছানি জীবনের প্রতি তাদের মনোভাবেও পরিবর্তন ঘটিয়েছে, আর জন্ম দিয়েছে এমনকি অদক্ষ শ্রমিক বা গৃহ-পরিচারিকা হিসেবেও শহরে পাড়ি জমানো বাসনার। অপরদিকে, আধুনিকায়ন কিছু কিছু লোকের জন্য বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগে প্রবেশের নানা অলিগলি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সমাজ যেন বর্তমান বাস্তবতার গুরুত্ব বুঝতে এবং এ বাস্তবতা মোকাবেলায় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে সমাজকে প্রস্তুত করার একটা সুযোগ আধুনিকায়ন নেতা-নেত্রীদের দিয়েছে।

একটি প্রাসঙ্গিক আদিবাসী ভাবধারা গড়ে তোলা

ভারতীয় আদিবাসী সমাজে পরিবর্তন ঘটছে। আর এই পরিবর্তনটা ঘটছে ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকে। আদিবাসীদের জন্য অতীব দুঃখের হল, বাইরের বিভিন্ন শক্তির চাপের মুখে পরিবর্তনগুলো খুব বেশী আর অধিকাংশই ধ্বংসাত্মক। এমনকি অনাদিবাসী বাস্তবতায় গড়ে ওঠা বন্ধুভাবাপন্ন বাইরের ভাবধারাগুলো আদিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে আশার কথা হল, বাইরের ভাবধারা ও দর্শনের ইতিবাচক দিকগুলোকে সমন্বিত ক'রে সংস্কারের একটি আদিবাসী ভাবধারা গড়ে উঠছে। এটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিবাসীদের জন্য একটি মর্যাদাসম্পন্ন ও ন্যায়সঙ্গত স্থান নিশ্চিত করবে।